শিশুদের বিকাশে পরিবারের ভূমিকা

লেখক: ডা. মোহসিনা বিনতে শরীফ | প্রকাশিত: 15 October 2026, 11:25 AM | বিভাগ: ফিচার

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"- আশি এবং নব্বইয়ের দশকে স্কুল পর্যায়ে খুব পরিচিত একটি ভাবসম্প্রসারণ ছিল এটি। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণির অর্ধবার্ষিক কিংবা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায়ই এই ভাবসম্প্রসারণটির উপস্থিতি দেখা যেত। এখন আর শিশুর মধ্যে আগামী দিনের পিতার স্বপ্ন দেখা হয় না। কারণ এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই ঘটবে। এখন শিশুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আগামী দিনের নির্বাহী হওয়ার। স্বপ্ন দেখে প্রযুক্তিবিদ হওয়ার। স্বপ্ন দেখে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার। কিন্তু আমরা যখন বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দিই তখন দেখা যায় বর্তমানে এদেশের অধিকাংশ বাবা-মায়ের স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে যায়। স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ নিতে দেখা যায় না। আমরা ঢালাওভাবে শিশুদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ করছি। শিশুরা পড়ালেখা করতে চায় না। কথা শুনে না। সারাদিন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। কম্পিউটার, ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত, আরও কত অভিযোগ। কিন্তু আমরা কখনো এটা বিচার করতে চাই না, পরিবারগুলো সত্যিকার অর্থে শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য কতটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। এই জায়গাটিতে মনে হয় আমাদের পরিবারগুলোকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সময় এসেছে।

প্রতি বছর জুন মাসের দ্বিতীয় শনিবার পালিত হয় "ফ্যামিলি হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস ডে"। দিবসটিকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে আমরা মণিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের

প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উদ্যোগী হয়ে “শিশুদের বিকাশে পরিবারের ভূমিকা” শীর্ষক একটি অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। আয়োজনে আমাদের সাথে বিভিন্ন ব্যাচের অনেকেই যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক ডা. সংগীতা হালদার এবং দৃক পিকচার লাইব্রেরি বাংলাদেশের মানবসম্পদ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও অ্যাডমিন দিল আফরোজ মুনিয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলাম আমি ডা. মোহসিনা বিনতে শরীফ। সন্তানের বেড়ে ওঠায় পরিবারের ভূমিকা, শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশ, অভিভাবকের দায়িত্ব এবং একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে কীভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। আলোচনায় সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

একটি শিশুর বেড়ে ওঠা শুধু তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। এই সামগ্রিক বিকাশের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো পরিবার। শিশুর প্রথম শিক্ষা, প্রথম সম্পর্ক এবং নিরাপত্তার অনুভূতি সবকিছুর সূচনা পরিবার থেকে। তবে শিশুর বিকাশ শুধু পরিবারের ওপর নির্ভর করে না। শিশু কোথায় এবং কী ধরনের পরিবেশে বেড়ে উঠছে তারও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। শহর, গ্রাম, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবনযাত্রা, পারিবারিক কাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, নিরাপদ খেলার জায়গা এবং সামাজিক পরিবেশ শিশুর বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ বা নিম্নআয়ের এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সীমিত বাসস্থান, অতিরিক্ত ভিড়, নিরাপদ খেলার জায়গার অভাব এবং নানা সামাজিক ঝুঁকি শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশে প্রভাব ফেলতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবার ও কমিউনিটির নিরাপদ, সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে একক পরিবার, কর্মব্যস্ততা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার কারণে অনেক শিশুই বাবা-মায়ের পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সন্তানকে ভালো স্কুল, ভালো খাবার কিংবা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে সময় দেওয়া এবং মন দিয়ে ওদের কথা শোনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিরাপদ ও আন্তরিক সম্পর্ক শিশুকে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। শিশুকে শাসন করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু শাসনের পাশাপাশি তাঁর কথা বলার জায়গাটিও তৈরি করতে হবে। শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর চোখের সমতলে বসে, শান্তভাবে ও চোখে চোখ রেখে যোগাযোগ করা একটি কার্যকর পদ্ধতি। এতে শিশু বুঝতে পারে তাঁর কথা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর অনুভূতিকে পরিবার মূল্য দেয়। পরিবারের পরিবেশ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বুলিং, পড়াশোনার চাপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা নানা সামাজিক চ্যালেঞ্জ থেকে তৈরি মানসিক চাপ মোকাবিলায় পরিবারকে শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠতে হবে।

সন্তান ভুল করলে, ভয় পেলে বা কোনো সমস্যায় পড়লে পরিবারের কাছে নির্ভয়ে ফিরে আসতে পারে এই বিশ্বাস তৈরি করা জরুরি। যৌথ পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুপু, ভাইবোন ও কাজিনদের সঙ্গে বেড়ে ওঠার মাধ্যমে শিশু ভাগাভাগি, সহযোগিতা ও পারিবারিক বন্ধনের মতো সামাজিক মূল্যবোধ শেখার সুযোগ পায়। তবে একক পরিবারেও সচেতনভাবে শিশুর জন্য এমন সামাজিক ও পারিবারিক সংযোগ তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া, সময়ের প্রয়োজনে, কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের নিরাপদ ও যত্নশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত এলাকাভিত্তিক একাধিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে-কেয়ার সেন্টার) গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এসব কেন্দ্র শিশুর পরিচর্যা, প্রাথমিক শিক্ষা ও সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং কর্মজীবী মায়েদের জন্য স্বস্তি ও নিশ্চয়তা তৈরি করবে।

সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বয়স অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। সব সিদ্ধান্ত বাবা-মা নিলে শিশুর স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই ভুল করার সুযোগ রেখে, প্রয়োজন মতো পাশে থেকে এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে শিশুকে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ এক নয়। একজন শহুরে শিশু যে সুযোগ পায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু হয়তো তা পায় না; আবার প্রকৃতি, পারিবারিক সংযোগ বা সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিবেশের শিশুর আলাদা অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। যেমন, শহুরে শিশুদের তুলনায় গ্রামীণ বা পাহাড়ি অঞ্চলের শিশুরা জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ তুলনামূলকভাবে সহজে মোকাবিলা করতে শেখে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সহাবস্থান, খোলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার চর্চা তাঁদের মানসিক দৃঢ়তা ও অভিযোজনক্ষমতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিপরীতে, শহুরে শিশুরা ক্রমেই প্রকৃতির বিশাল ও বৈচিত্র্যময় পরিসর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কংক্রিটের দেয়াল, সীমিত খেলার জায়গা এবং প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তাঁদের শৈশব অনেকটাই পাথরের খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়ছে। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি মিথস্ক্রিয়া, স্বাধীনভাবে খেলা, সামাজিক যোগাযোগ এবং বাস্তব জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছে যা তাঁদের সামগ্রিক বিকাশের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। শহুরে এলাকায় শিশুর জন্য ভালো স্কুল, চিকিৎসাসেবা, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে যানজট, দূষণ, অতিরিক্ত স্ক্রিন-নির্ভরতা, খেলার জায়গার অভাব এবং বাবা-মায়ের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা শিশুর স্বাভাবিক সামাজিক ও শারীরিক বিকাশে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রকৃতি ও খোলা জায়গার সঙ্গে শিশুর বেশি যোগাযোগ থাকলেও মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক সুযোগের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। অর্থাৎ, ভৌগোলিক অবস্থান শিশুর সম্ভাবনাকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করে, অন্যদিকে পরিবারের সচেতনতা ও সহায়তা অনেক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে। তাই শিশুর বিকাশ মূল্যায়নে শুধু পরিবার নয়,

পরিবারের সঙ্গে তাঁর ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকেও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার সবচেয়ে বড় উপাদান বস্তুগত সুযোগ, ভালোবাসা, সময়, ধৈর্য, নিরাপদ পরিবেশ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং খোলামেলা যোগাযোগ। এগুলোই পারে প্রতিটি শিশুকে সামগ্রিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে। একটি সহানুভূতিশীল পরিবার এবং শিশুবান্ধব পরিবেশ থেকেই গড়ে উঠতে পারে আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল ও মানবিক প্রজন্ম। আর আজকের শিশুই আগামীর বাংলাদেশ। আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি আমাদের শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে এই দায়ভার আমাদেরই বহন করতে হবে, যার পরিণতি হয়তো কারও জন্যই ভালো হবে না।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।